C44

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 09 NOV 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

(৩৮)

দৈনিক বাংলা

পরীক্ষার্থীর হাজারো বিড়ম্বনা

পরীক্ষাকে কেন পরীক্ষার্থী মাত্রই ভয় পায়? কেন এমনিতে যেমন তেমন, পরীক্ষা ঘনিয়ে এলেই ছাত্রছাত্রীরা মন-মরা হয়ে যায়?

বিষয়টি ভেবে দেখার মত অবশ্যই। এমনতো নয়, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র অজানা অচেনা বিষয় থেকে হয়—অথবা শিক্ষার্থীদের অনাবশ্যক হয়রানি করার জন্যই পরীক্ষার প্রচলন।

পরীক্ষার মধ্য দিয়ে একজন শিক্ষার্থীর সাধনার সফলতা ধরা দেয়, নির্ণিত হয় মেধার মান। পরীক্ষাই বিদ্যার্থীর আহরিত বিদ্যার বিশেষ পরিমাপক হয়ে তার গতি অগ্রগতির পথ করে দেয়, দিতে সক্ষম।

এই অর্থে 'পরীক্ষা' 'বন্ধুর' কাজ করে—প্রস্তুতি পর্বের তিতিক্ষার অবসান ঘটিয়ে স্বস্তির সন্ধান দিতে পারে।

কিন্তু বাস্তবে তা হওয়ার-ই নয়। পরীক্ষাকে 'বিপজ্জনক' ধরে নিয়ে তাকে মোকাবিলা করার জন্য পার্থিব অপার্থিব যাবতীয় দাওয়াইর আশ্রয়ী হতেই মন চায়।

তদবিরের গুণে বা প্রভাবের বদৌলতে আর সব ক্ষেত্রে পরীক্ষাকে পাশ কাটানো গেলেও সম্ভব হয় না একটি ক্ষেত্রে—তা হচ্ছে বোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন্যাল পরীক্ষা।

অবশ্য অধিকাংশ বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়েই পরীক্ষায় অবতীর্ণ না হলে এবং উত্তীর্ণ না হলে প্রমোশন দেয়ার ব্যবস্থা নেই। এ কারণেই বছর ভরে হেলাফেলায় কাটিয়ে পরীক্ষার সময়ে পরীক্ষার্থীদের হিমশিম খেতে দেখা যায়। নাওয়া খাওয়া ভুলে দিনরাত বইখাতা নিয়ে তারা পাঠে মগ্ন হয়। এই উৎকন্ঠ-মগ্নতা অনেক ছাত্রছাত্রীর মানসিক স্থিতি পর্যন্ত নষ্ট করে দেয়—পরীক্ষার পড়া কিছুই মনে থাকে না, 'শত পড়েও মুখস্থ হয় না' এমনি সব অস্থির, কথাবার্তা বিদ্যার্থীর কাছে শোনা যায়। মানসিক দুর্বল যারা—তারা তো খেই হারিয়ে ফেলে—বাচালতায়—গাম্ভীর্যে হাসিতে-কান্নায় নিয়মের বাইরে আচরণ করে—পরিবারের উদ্বেগের কারণ হয়।

জিজ্ঞাসা জাগে—কেন এমন হয়? এমন হওয়াতো স্বাভাবিক নয়। সাধারণ সংজ্ঞা সূত্র বলে—পরীক্ষা হচ্ছে পরীক্ষার্থীর জ্ঞানের পরিমাপক, সেই জ্ঞান যা সে আহরণ করেছে তার নির্দিষ্ট পাঠসূচী থেকে। এই পাঠ্য আবার নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই আবর্তিত। এমন সুচিন্তিত পরিকল্পিত হিসাব-নিকাশের মধ্যে পরীক্ষায় পাঠের বহির্ভূত কিছু থাকার অবকাশ নেই—নেই প্রশ্নপত্রের প্রশ্ন অজানা অচেনা হওয়ার।

পর্যালোচনা বা বিশ্লেষণে দেখা যাবে—প্রশ্নপত্র অচেনা হয় কমই, হয়ই না বলা যায়। বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত কিছু বিধির কল্যাণে প্রশ্ন-তৈরির পদ্ধতি একটি বাঁধা ছকের আওতায়। প্রতি বিষয়েই কোন বছর কোনটা দরকারী, বলা যায়, অনুমান মিলেও যায়। এর পরেও পরীক্ষা নিয়ে একটি অনিশ্চয়তা অনুভব কেন পরীক্ষার্থীদের কুরে কুরে খায়?

বলা হতে পারে কিংবা মনে হতে পারে—বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন মান-এর জন্যই এমন হয়। এ যুক্তিও ধোপে টেকার নয়। পরীক্ষার 'সাজেশন' আজ আর প্রতিষ্ঠান নির্ভর নয়। টেস্ট-পেপার, আর কিছু না হলেও ঐ টেস্ট পেপারগুলোতেই দিব্যি মোক্ষম সাজেশান পাওয়া যায়।

তাহলে সমস্যাটা কোথায়? পরিচিত সিলেবাস, পরিচিত পরিবেশ, গৎ-বাঁধা প্রশ্নপত্র, এর পরেও ভয় কেন, বাসা বাঁধে মনে, গেরো পাকায় মাথায়?

একটু ভেবে দেখলে বোঝা যাবে, এই দ্বিধা, এই শংকা অকারণ নয়। এর মূলে রয়েছে উত্তরপত্র মূল্যায়নের পদ্ধতি। উত্তরপত্র মূল্যায়নের পদ্ধতি বাস্তবিকই অনিশ্চিত ভিত্তির—এর কোনও বাঁধা নীতি নেই।

এমনিতেই আমাদের বর্তমান পরীক্ষা 'রচনামূলক'। এর মূল্যায়নে পরীক্ষকের জন্য নির্ধারিত 'মানদন্ড' নেই। নেই বলা ঠিক নয়, আছে, তবে তা বিশেষভাবে পরীক্ষকের চিন্তা চেতনা নির্ভর। যার ফলে একই প্রশ্নের একেক ধরনের উত্তর লিখে একেক পরীক্ষকের হাতে পেতে হয় একেক নম্বর।

অনেক পরীক্ষক মনে করেন যে কোনও প্রশ্নের বৃৎসই 'ভূমিকা' ও 'উপসংহারই' 'জবাব'-এর প্রাণ—আবার অনেকে 'গৌরচন্দ্রিকা' ও শেষের 'টীকা-টিপ্পনিকে' মনে করেন বাহুল্য, অকারণ।

'সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন' সাম্প্রতিক কালের সংযোজন। এর লক্ষ্য—পরীক্ষার্থীর পূর্ণ বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান নিরূপণ। ভিন্নমত এই 'সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন' নিয়েও। কেউ মনে করেন—এর দৈর্ঘ্য হওয়া উচিত উত্তরপত্রের এক পৃষ্ঠার মধ্যে—কেউ মনে করেন, একে নিদেনপক্ষে দেড়-দুই পাতা হতেই হবে।

সাহিত্য বিষয়ে 'ব্যাখ্যা' ছাড়া ছোট-বড় প্রশ্নে কবি-লেখকের নাম উল্লেখ অনেকের অপছন্দ—আবার অনেকে মনে করেন ঐ নামগুলোই উত্তরের 'অপরিহার্য' অঙ্গ। বাংলা সাহিত্যের উত্তরে অন্য ভাষা, বিশেষত ইংরেজী সাহিত্য, থেকে উদ্ধৃতি অনেকের চোখে 'জবাব'-এর সমৃদ্ধি আনে—অনেকে আবার তাকে অনাবশ্যক বাচালতা মনে করেন। অনেকে একই জবাবে অনুরূপ কোটেশন বাংলা ভাষা থেকে দেওয়া বর্ণাঢ্যতা মনে করেন—অনেকে তাকেও প্রগলভতা বলে ধরে নেন।

এসএসসি পর্যায়ের পরীক্ষার্থীর উচ্চতর বই থেকে রেফারেন্স টেনে জবাব লেখার প্রয়াস অনেকের কাছে প্রশংসার—অনেকের কাছেই আবার তা ডেঁপোমি এবং প্রবণতা। অন্যের তৈরি বলে ধরে নিয়ে তাকে কোণঠাসা করার। ভূগোল বিষয়ে প্রতি প্রশ্নের জবাবে মানচিত্র এঁকে বক্তব্য সমর্থন করা অনেকে ভাল মনে করেন, অনেকে কথায় কথায় অর্থাৎ না চাইলে চিত্রাংকন বেদরকারী মনে করেন। এই মানচিত্রেই রঙিন পেন্সিল বা রঙের ব্যবহার কেউ মনে করেন ভাল, কেউ বা বলেন অন্যায়।

এমনি মতভেদ আছে সব বিষয়েই। যেমন, যদি বোঝা যায়, নোট বই থেকে লেখা, তাহলে নম্বর কোন সনের হবে? কেউ মনে করেন, শিক্ষার্থীর লেখা কতোটা শুদ্ধ, তার উপস্থাপনার মান কতোটা। ভালো, তাই বিচার্য,—তবে উৎস নয়, কেউ বলেন, তা কেন, যদি ধরা যায়, এ উত্তর নোট বইয়ের, তাহলে অত পার্সেন্টের বেশি নম্বর কোনও মতেই দেয়ার নয়।

আজকাল আবার কিছু কিছু কেন্দ্রের নকলের অভিযোগ থাকে। মজা এই, কেন্দ্র নকল ধরে না, স্ক্রীপট-এও মন্তব্য থাকে না, এমন কি সুনির্দিষ্ট কেন, অস্পষ্ট কিংবা ঝাপসা রিপোর্টও দেয়া হয় না। অতএব পরীক্ষকদের মধ্যে কারো কারো মত—ভাল মান ও নির্ভুল উত্তরপত্র হলেই বুঝে নিতে হবে নকল, তাই যত ভালই হোক—রাশ টানতেই হবে। দেয়া যাবে না প্রথম বিভাগ, স্টার বা লেটার মার্কস। আবার অনেকে মনে করেন, এ ঠিক নয়। মান উঁচু ও লেখা উত্তম হলেই তা 'নকল' বা 'আর কিছু'—এমন ঢালাও ধারণা অন্যায়। যদি 'নকল' হয়, যদি তা চিহ্নিত করতে কেন্দ্র ব্যর্থ বা দ্বিধান্বিত হয়, তবে সে দায় কেন পরীক্ষকের ওপর বর্তায়?

এসব কারণেই 'পরীক্ষা' আজ পরীক্ষার্থীর কাছে বড় বেশি অনিশ্চিত। লিখলেই ভাল হবে, ভাল করে পড়লেই ফলাফল ভাল হয়ে যাবে, এ আশা আজ যেন আর করার নয়।

পরীক্ষার্থীদের ভাগ্য বড় বেশি অনিশ্চিত—অনেকটা লটারীর মত। কেমন মতবাদের, কেমন ধরনের লেখা পছন্দের পরীক্ষকের কাছে উত্তরপত্র পড়বে—কে জানে! তাই ভাল লিখেও কোমল পরীক্ষার্থীকুলের মন সংশয়ে শংকায় দুরু দুরু করে।

সংশয় নিদারুণ আতংকে রূপ নিচ্ছে। আজকাল কেন্দ্র থেকে যে খাতা সেলাই করা হয় (মূল খাতার সঙ্গে লুজ শীট), তাও খুলে যায় কোন এক পর্যায়ে—পৌঁছায় না পরীক্ষকের হাতে। ফলে নম্বর অপ্রত্যাশিত হয়—এমন কি ফেলও হতে হয় সময় সময়। এ হচ্ছে সভ্যতার অবদান। আজকাল স্ক্রীপট জোড়া লাগাতে সেলাই করা হয়—স্ট্যাপল করা হয়—সেই পিনের মোটা খাতার সকল পাতা আটকে রাখার সাধ্য নেই।

কাজেই বেচারা পরীক্ষার্থী জানেও না—তার জন্য ভাগ্যের কত রকমের মার অপেক্ষা করে আছে। সে যদি ভালোয় ভালোয় শ্রম-সাধনার যোগ্য ফল পায়—বুঝতে হবে বরাতের জোরে।

ঐ বরাতটাই পরীক্ষার্থীরা এখন বড় বেশী মানে। এই বরাতের চিন্তাই পরীক্ষার্থীকে দিনকে দিন 'পরীক্ষার' প্রতি এমন বৈরী করে তুলছে।

—হোসনে আরা শাহেদ